আব্দুল জব্বারের আশ্চর্য গ্রন্থ বাংলার চালচিত্র

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক মার্ক টোয়েনকে ভালোভাবে বুঝবে বলে এক সমালোচক তাঁর গ্রামে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে এক বুড়োকে পাকড়াও করে। মার্ক টোয়েনের লেখা তার কেমন লাগে জানতে চাইলে বুড়ো অবলীলাক্রমে বলে দেয়— মার্ক টোয়েনের সব গল্প তারও জানা আছে। টোয়েন তা লিখে বইতে ছেপেছেন, এইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। বুড়ো ঘুণাক্ষরেও বোঝেনি সে নিন্দার ছলে নিজের অজ্ঞাতসারে টোয়েনের কতখানি প্রশংসা করল। সাহিত্যিক আব্দুল জব্বার সম্পর্কেও তাঁর গাঁয়ের কোনো সমসাময়িক বুড়ো একথা বলতে পারত।

এক কথায় আব্দুল জব্বারের সম্বন্ধে বলতে গেলে এর চেয়ে বড়ো প্রশংসা আমার জানা নেই।

তিনি মাটির থেকে উঠে আসা মানুষ। তবে মাটি নিয়ে লিখে গেছেন এমন পূর্বসূরির অভাব নেই। অনেকে সে মাটিকে দেখেছেন দূর থেকে, অনেকে কাছ থেকে। বাংলার কথা-সাহিত্যের অন্যতম অগ্রপথিক শরৎচন্দ্র তাঁর চেনা মাটির কথা লিখেই বড়ো হয়েছেন। বিভূতিভূষণও অননুকরণীয়ভাবে তাঁর চেনা মাটির কাহিনি লিখেছেন পথের পাঁচালী বইতে। কিন্তু, সে সব মাটি আর জব্বারের মাটি আলাদা। আলাদা বলেই সাহিত্যজগতে তার মূল্য আছে। নইলে তা হয়ে দাঁড়াত শরৎ বা বিভূতিবাবুর নিছক নকল। নিজস্বত্ব না থাকলে, নতুন কিছু বলবার না থাকলে সাহিত্যের কড়া বিচারক মহাকাল তাতে ঢেঁড়া দিয়ে বাতিল করে দেন।

শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ মূলত গ্রাম - সমাজের উপরের স্তরের মানুষের কথা লিখেছেন। তাঁরা কেউ সম্পন্ন, কেউ দরিদ্র। কিন্তু জাতি- ব্যবস্থার পিরামিজে তারা বর্ণ - হিন্দু অথবা শিক্ষিত মুসলমান (যেমন গহর)। সমাজের নীচের দিকে মানুষের কথাও যে তাঁরা বলেননি তা নয়, যখন বলেছেন, তা বলেছেন মর্মস্পর্শী বাস্তবসম্মতভাবেই। বলেছেন নিজেদের উপলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এরা তাঁদের রচনায় সাধারণত প্রাধান্য পায়নি। এটা দোষের নয়। খাঁটি লেখকের ধর্ম হল যাঁদের তিনি সত্যিকারের চেনেন, তাঁদেরই কথা বলা। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এই চেনার পরিধি, অভিজ্ঞতার জগত আর একটু প্রশস্ত হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখলেন গ্রামের মানুষের কথা। তাতেও কখনো ভিড় করে এল চাষা - ভুষো - জেলে - বাগদিরা। জব্বারের রচনার আলোচনার অনেক বাংলা গ্রন্থের মধ্যে যে দুটি গ্রন্থের উল্লেখ না করলেই নয়, সে দুটি হল প্রাক্-জব্বার সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াইচরিত মানস এবং ইদানীংকালের আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা। তবু এঁদের কারো সঙ্গে বাংলার চালচিত্রের লেখক জব্বারের তুলনা চলে না। যে পূর্বসূরিদের কথা বললাম, তাঁরা মূলত ঔপন্যাসিক ও তারপর গল্পকার। অন্যদিকে বাংলার চালচিত্র-কে সমালোচকরা মূলত 'ফিচার -ধর্মী বলে অভিহিত করেছেন। জব্বার কিন্তু পূর্বসূরিদের ঋণ অস্বীকার করেননি। শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণকে নিজের বই উৎসর্গ করেছেন। বাংলার নৈবেদ্য গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে শরৎচন্দ্রকে 'পূর্বপুরুষ' বলে অভিহিত করেছেন। আর আলোচ্য বইটিই তো বিভূতিভূষণকে উৎসর্গ করা। সেখানে তাঁকে 'বাস্তবের নিখুঁত শিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয়ভাবে বিশেষ উল্লেখ করেছেন তাঁর পথের পাঁচালী ও আরণ্যক গ্রন্থদুটির।

কী আছে বাংলার চালচিত্র বইটিতে? একটি দ্রুত পরিক্রমায় দেখে নেওয়া যাক। এতে নানা রসের আয়োজন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই রচনায় তিনটি মাত্রা বা dimension লক্ষ করেছেন — সাহিত্যিক, সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করব।

সামাজিক মাত্রা : আবার সুনীতিবাবুর ওই লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। আলোচ্য বইটির ভূমিকা - স্বরূপ তাঁর লেখা 'দুটি কথা'-য় তিনি বলেছেন— 'এঁর বইয়ের একটা 'ডকুমেন্টারি ভ্যালু" অর্থাৎ যাকে নক্‌লি হিন্দুস্থানিতে বলা যায় ''দলীলানা কীমৎ'' আছে।' এখানে আর একটি পূর্বজ গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হল হুতোম পাঁচার নক্সা। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই বইতে তাঁর দেখা মানুষের কথা নিঁখুতভাবে লিখে গেছেন। জব্বারের মতোই তিনি কাউকে রেয়াৎ করেননি। তবে তিনি মূলত ক্ষয়িষ্ণু বাবুসমাজের কথাই লিখে গেছেন, সাধারণ মানুষেরা প্রাসঙ্গিক হলে তবেই এসেছে। জব্বার সেখানে মূলত অতি সাধারণদের মধ্যেই বিচরণ করেছেন। কালীপ্রসন্নের লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর wit। জব্বারের লেখায় এই বৈশিষ্ট্য তেমন নেই। আবার জব্বারের লেখায় বনেদি সাহিত্যের চরিত্রটি কালীপ্রসন্নে তেমন নেই। তবে দুজনেরই বিশেষত্ব তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। তাই দুই ভিন্ন সময়ের, দুই ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতের এবং দুই ভিন্ন লিখনশৈলীর লেখক দুজনকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও পাশাপাশি বসালাম।

আব্দুল জব্বার এই বইটিতে প্রধানত তাঁর পারিপার্শ্বিকের অতি সাধারণ মানুষের কথা লিখেছেন। এদের মধ্যে আছে গোরুর দালাল ও থানার দালাল, নদী ও সমুদ্রের জেলে, চটকল শ্রমিক, চাষি, পান চাষি, বাঁশিওয়াল, সাপুড়ে, দর্জি, মহাজন, পুলিশ অফিসার, কুমোর, মারোয়ারি, পাঁপড়ওয়ালা, বাংলা মদ -ওয়ালা পুরুষ - মোল্লা - মৌলবি, কসাই, কাটুরে, রাজমিস্ত্রী, মুচি, গাড়োয়ান, তাঁতি, ফকির মায় ভিখিরি, হিজড়ে ইত্যাদি আরও কত। এরা অনেকেই একা নয়, বরং সপরিবারে হাজির। কর্তা-গিন্নি, ছেলে - পুলে পরিজন সমেত— এমনকী ভিখিরি পরিবারটিও। চরিত্রগুলির প্রায় সবাই সাধারণ মানুষ। কেবল কাজি দৌলত হোসেন, দারোগা ফিরোজ দা,

মিল-মালিক সাহেব হেনরি মিচেল, ফকির জিয়া হায়দার, দানসাদ মিস্ত্রি বা দঢানী-পাগলা নাদের মল্লিক— এরকম দুটি-চারটি মানুষ হয়তো মানুষ হিসেবে একটু অন্য স্তরে অবস্থানের দাবী করতে পারে। সাধারণ মানুষেরা এখানে এতই সাধারণ, যে এদের কথা বলবার কথাও সাধারণ লেখকেরা ভাববেন না, বা ভাবলেও এদের সত্যিকারের অন্তরের কথা এদের মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। এই বইটির স্থানিক বৈশিষ্ট্য হল যে এর ভৌগোলিকতা মূলত বাংলার দক্ষিণাংশের, বা আরও নির্দিষ্ট করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই লেখকের নিজস্ব চারণভূমি বজবজ বাওয়ালি ও তার আশপাশের কথা বেশি করে এসেছে এই গ্রন্থে। অবশ্য হুগলী বা মেদিনীপুরের মতো অঞ্চলও আছে, কিন্তু সে মাটির সঙ্গে লেখকের পরিচয় তত নিবিড় নয়। তাই বইটির নাম হিসেবে বাংলার চালচিত্র যতটা তার চেয়ে দক্ষিণবঙ্গের বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চালচিত্র নাম গ্রন্থটির বেশি পরিচায়ক হত, যদিও হয়তো শুনতে ততটা ভালো হত না।

আগেই বলেছি জব্বার এই রচনায় যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি জলজ্যান্ত মানুষ এনেছি, চরিত্র এনেছি— এরা গাঁয়ের মানুষ, ক্ষেতে - খামারে, কলে- কারখানায় কাজ করা অন্ধকারের প্রাণী।' বলছেন, 'আমি ভূমিহীন কৃষক ও কারখানার শ্রমিকের ঘরের সন্তান, সুখে - দুখে আজও আমি তাদের কোলেই রয়েছি। তাদের যেমন দেখেছি, জেনেছি, নির্ভেজালভাবে কোনো রং না চড়িয়ে সেভাবেই চিত্রিত করেছি।'

ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রা : এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না জব্বার এই গ্রন্থে তাঁর চরিত্রগুলির মুখে তাদের মুখের ভাষাই অবিকল দিয়েছেন। বাংলায় এমনটা আগে এতখানি করে দেখিনি। মার্ক টোয়েনের অবিস্মরণীয় Tom Sawyear's School Days এবং Huckleurry Finn উপন্যাস দুটির কথা আবার মনে পড়ে— স্থানীয় ভাষা- ভঙ্গীর নিটোল ব্যবহারের জন্য, সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে তাঁর প্রচ্ছন্ন মনোভাবের জন্য নয়।

সুনীতিবাবু তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, 'এঁর রচনা যে মেকি নয় তার প্রমাণ জীবনের সব দিক দিয়ে বাংলার ঘরোয়া শব্দে ভরপুর। আর সেই সব শব্দ স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে দিয়ে গেছেন, আর এতে ইনি একটা আনন্দ পেয়েছেন।' অন্যত্র সুনীতিবাবু তাঁকে 'ডিকশনারি অভ দা ভিলেজেস' বা গ্রামবাংলার অভিধান এই আখ্যা দিয়েছেন। জব্বারের এই বইয়ের কোনো কোনো লেখায় শব্দমালা প্রায় অভিধানের ঢঙে আবির্ভূত। কিংবা বলা যায় সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুমের মতো একটি কোষগ্রন্থের উপাদান আছে এতে। 'ধানের নাম লক্ষ্মী' লেখাটিতে আছে এক লপ্তে 'একশ দশ' রকমের ধানের কথা। তারা আবার শ্রেণিবিভাজিত।

ভাত, পিঠে, পায়েস, পোলাও, চিঁড়ে, খই হয় যে ধানে	—	১০ রকম
কেবল ভাত, চিঁড়ে, খই হয় যে ধানে	—	৬৯ রকম
মুড়ির ধান	—	২০ রকম
আউশ ধান	—	২ রকম
বিদেশী আধুনিক বোরো ধান	—	৯ রকম

কত রকম নাম সে সব ধানের। কিছু কিছু চেনা, বাকি সব অচেনা। তার মধ্যে কনকচুড়ী, রাঙি-ময়ুরলতা, মাউলতা, দুধকমল, আকাশপালি বা ভাসামানিকের মতো শ্রুতিসুখকর নাম যেমন আছে, তেমনি আছে মাগুরডিমে, ট্যাংরা ছিলেট, ধোবোলুটি, গেঁড়িমুটির মতো খরখরে নাম। মজার দিশি রূপান্তর পাই বিদেশি ধরনের নামের ধানের। যেমন বারোশ একাশি হয়েছে মাসিপিসি, আই আর এইট সোগাহী, তাইচুং বামনঝাঁটি, তাইনান বিদেশিনী। হান্টারের ডিস্টিক্ট গেজেটিয়ারে অনেক নাম না জানা ধানের নাম পেয়েছিলাম। সে তালিকা মূল্যবান। কিন্তু জব্বারের তালিকা আরো সমৃদ্ধ।

ধানের নামের মতোই বাঁশের নামের তালিকা 'তিরোল বোনে বাঁশের আটল', গাছপালার স্থানীয় নামের তালিকা 'মেদিনীপুরের ফকির', আর পানের নামের তাল্কি 'পান' — এই লেখাগুলিতে। আছে রাজমিস্ত্রির কাজের, মুচির কাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, গোরুর গাড়ির বা তাঁতের বিভিন্ন অংশের নাম।

তাঁর দেখা অঞ্চলের চাষা-ভূষো-কুমোর - কামার-তাঁতি - মিস্ত্রি সাধারণ মানুষের মুখের কথাই তিনি তাদের মুখে বসিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি মানুষের ভাষা মানুষের মুখে বসাতে চেয়েছি। তোমরা আমাকে যতদিন পড়বে ততদিন তো এই শব্দগুলো বেঁচে থাকবে— সেই ব্যবস্থাটাই আমি ক'রে গেলাম। না হলে ওগুলো তো হারিয়ে যেত।'

এইসব শব্দের স্থূল শ্রেণিবিভাগ করে নিয়ে একটা প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তবে উদাহরণ বেশি দেওয়ার লোভ সামলাতে হচ্ছে। তিনি অক্লেশে ব্যবহার করেছেন আমাদের জানা না জানা গ্রামের মানুষের মুখের দেশজ শব্দ। যেমন খাপড়া, পাকাল পিঠে, করঞ্জ, সেদো, আলা এরকম আরও অনেক। আ করেছেন আরবি, ফারসি, হিন্দি - উর্দু থেকে আসা বাঙালি মুসলমানের মুখের শব্দ— জায়েজ, লোবান, পীরহান, গোসল, জানাজা, ওজু, হুর, গেল্‌মান, কুলুপ, অছড়া, দলিজ, ওস্তাগার, ইন্তেকাল, কিয়ামত, জেনা ইত্যাদি কত, এক জায়গায় অহংকার করে বলেছেন বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষা অনেক লেখকেরই জানা নেই। পরিচিত

শব্দগুলির অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে রূপান্তরিত ফর্ম ব্যবহার করেছেন অনায়াসপটুত্বে— গোঁদরোক (গন্ধক), যৈবন (যৌবন), লৈকতা (লৌকিকতা), অর্গগেরে (অগ্রে), ফাদ্‌রাফাই (ফর্দাফাই), ভেক্‌টি (ভেটকি)। যেমন বাংলাভাষা থেকে উদ্ভুত শব্দের ক্ষেত্রে, তেমনি ইংরিজি শব্দের ক্ষেত্রেও— ইলিক-টিলিক (ইলেকট্রিক) হেরেকেন (হ্যারিকেন), পেরাইপিট (প্রাইভেট), সারপোষ পেনসিন (সার্ভিস পেনশন)। কথায় কথায় এই মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রে শব্দচয় সন্ধিবদ্ধভাবে ব্যবহার করেন, যার উল্লেখ ব্যকরণ বইয়ের সন্ধি বিষয়ক অধ্যায়ে তত গুরুত্ব পায় না। তারও উদাহরণ পাই, যেমন লেস্‌তে = + আসতে। অনেকক্ষেত্রে জব্বার শহুরে ভাষায় ব্যবহৃত যুক্ত- শব্দের স্থানীয় রূপ দেখিয়েছেন। যেমন কান্নাকাটির বদলে কান্নাগোল, বাপ - দাদার আমলে বদলে বাপকেলে। জব্বার মুন্‌শিয়ানার সাথে দেশজ শব্দ-দ্বৈতের সুন্দর ব্যবহার করেছেন— টাউঢাউ (শিশি বার করে সোডা খায় টাউঢাউ করে।)।

এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দই এত অপরিচিত যে সব সময় অর্থ ধরা যায় না, আন্দাজ করে নিতে হয়, পাঠক থমকে যায়। তবে এতে লেখকের দোষ দেখি না। এ দোষ সম্পাদনার। ইংরিজি সাহিত্যে এ জাতীয় উপভাষা ব্যবহারকারী গ্রন্থের সঙ্গে পাদটীকা বা এমনকী কখনো পৃথক glossary থাকে। বইটির পরবর্তী সংস্করণে আমরা আরও যত্ন ও মননশীলতা আশা করব।

জব্বারের ঝরঝরে ভাষাভঙ্গী এই বইয়ের সম্পদ। সৈয়দ মুজতবা আলি তুর্গেনিভের রচনার স্বাভাবিকতার উপমা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তা সুরার মতোই বহমান, জব্বারেরও তাই। অথবা আর একটু ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে বলা যায় জব্বারের রচনা গোরুর বাঁট থেকে নিঃসৃত সদ্য দোওয়া দুধের মতোই স্বাভাবিক তরল, তাকে জাল দিয়ে তিনি অতিরিক্ত ঘন করে ফেলেননি।

তবে কোথাও কোথাও তাঁর শব্দ - ব্যবহার যে বেমানান লাগেনি তা নয়। যেমন 'জনক' রচনাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি— 'জঙ্গলের নরখাদক বাঘের মত ভয়ংকার আর হিংস্র— টেরিফিক আর ফেরেসাস চরিত্র চাষী ইনসানের।' এখানে ভয়ংকর আর হিংস্র এই দুটি শব্দের পরে প্রায় অনুবাদ ইংরেজি শব্দ টেরিফিক আর ফেরোসাস বসানোয় নতুন কোনো মাত্রা যোগ হয়নি, বরং রসের ব্যত্যয় ঘটেছে।

পরিশেষে একথা বলা দরকার যে কোনো ভাষার যে মূল স্রোত তা যতদিন বহমান থাকে ততদিন সে উপভাষাগুলি থেকে আহরণ করে। এই উপভাষাগুলি উপনদীর মতো তাতে এসে মেশে। পাঁক যেমন আসে, তেমনই আসে টাটকা জল আর নতুন স্রোতের গতি। আবার যখন ভাষা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার এই প্রবণতা কমে যায়, তখন স্রোতঃস্বিনীর বদলে যে পলিমাটিকেই আশ্রয় করে ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে জব্বার মূল স্রোতের বাংলাভাষাকে এই উপনদীর সন্ধান দিয়েছিলেন। এখনকার বাংলাভাষা সাহিত্যকে বহমান রাখা এরকম আরও জব্বারের আশু প্রয়োজন।

সাহিত্যিক মাত্রা : এতক্ষণ আমরা বাংলা চালচিত্র গ্রন্থে জব্বারের লেখার পরিপ্রেক্ষিত ও কৌশলগত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবার সাহিত্যের মূল্যর কষ্টিপাথরের যাচাই করে দেখতে হবে, বুঝতে হবে তাঁর অবস্থান কোথায় আর কতটা কালজয়ী। যেখানে তাঁর জন্মস্থান, তাঁর বেড়ে ওঠার পরিসর সেই বজবজ বাওয়ালি - সাতগাছিয়াকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার করেছেন। সেই পরিধির মধ্যে মানুষের সাথে মিশেছেন গভীরভাবে। তাদের অনাড়ম্বর অথচ দৃঢ় ও লড়াকু জীবনযাত্রাই তাঁর এই গ্রন্থের উপজীব্য। কিন্তু কেন তিনি এই পরিবেশকে, এই জীবনযাত্রাকে তাঁর সাহিত্যে হুবহু গ্রহণ করলেন? কেন তিনি Sommerset Maughm-এর মতো করে ভাবলেন না যে জীবনটা ঠিক যেমন তাই সাহিত্য নয়, তাকে কিছুটা উপযোগী করে পরিবেশন করতে হয় (Ashenden Series -এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তাঁর রচনা অনুধাবন করলে মনে হয় এ কোনো অর্জিত বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত প্রয়াস নয়, এ জব্বারের সহজাত প্রবৃত্তি। সেজন্যই তিনি একথা বার বার বলেছেন যে তিনি যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে যাঁদের সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা তখন অনেকেই আসল নামে মৃত বা জীবিত। শুধু খারাপ লোকের নাম পালটে দেওয়া হয়েছে।

এখানে একটি কথা খেয়াল রাখতে হবে। তিনি যাঁদের নিবিড়ভাবে দেখেছেন, চিনেছেন, যাঁদের কথা বিশ্বস্তভাবে লিখেছেন, তাঁরা কিন্তু তাঁর রচনার পাঠক নন। তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠক হল সাহিত্যরসিক শিক্ষিত পাঠক, গ্রামের গরিব - গুরবো অশিক্ষিত মানুষেরা নয়। তিনি নিজেও একথা বুঝতেন বইকি। তাই বলেছেন, 'যাদের জন্য আমরা লিখছি, যাদের জীবন নিয়ে লিখছি, উন্নত জীবন গড়ে তোলার জন্য সচেতন ও সংগঠিত করার কাজ করছি বলে মনে করছি, আসলে তারা আমাদের এইসব লেখা ও সৃষ্টির খবরও রাখে না।' সমকালীন সাহিত্যচর্যার এই এক অনিবার্য ট্রাজেডি। জব্বার অন্যদের তো নয়ই, নিজেকেও রেয়াৎ করেননি।

জব্বারের একটি প্রবন্ধের শিরোনাম— 'মানবতা ও সত্যের পথ চিরকাল খোলা রাখুন'। এখানে একজন নতুন লেখকের (আসলে নিজের) দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বলেছেন, 'সত্যই হল এখন তাঁর ঈশ্বরস্বরূপ। নিজের সম্প্রদায়, অন্য সম্প্রদায়, রাজা- উজির যেই হন না কেন সত্যের কষ্টিপাথরে দেখে যদি অসার বা অসত্য প্রকাশ পায়, তবে তা সাহসের সঙ্গে অত্যন্ত রসাল ভাষায় প্রকাশ করবেন।' আব্দুর জব্বার সত্যান্বেষী, রসিক তাই তিনি এখনও পঠনীয়।

১৯৬৯ - ৭০ সালে জব্বারের বাংলা চালচিত্র যখন ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় বার হচ্ছিল, তখন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছিল। অনেকেই একে ফিচার আখ্যা দিয়েছিলেন। জব্বার নিজে লেখাগুলিকে কোনো বিশেষ অভিধায় পরিচয় দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে লেখাগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে সব সমান চরিত্রের নয়। বইয়ের সূচি - বিন্যাসের অনুক্রমেই এগুলি দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল কি না, তা এই আলোচকের জানা নেই, জানা থাকলে ভালো হত। তবে অনুমান হয় শেষ দিকে অভিজ্ঞতার ঝুলি কিছুটা হলেও ফাঁকা হয়ে আসছিল, কিস্তি ভরাবার জন্য তাঁকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হচ্ছিল। এবার রচনাগুলির একে একে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে স্বল্প পরিসরে সব কটিকে নাড়াচাড়া করা মুশকিল। তাই সবকটিকে ছুঁয়ে গেলেও তার কয়েকটি বেছে নিয়ে আমরা একটা বিশদে দেখব। এ বইয়ের নামকরণে চালচিত্র কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে জব্বার নিজেই লিখেছেন— 'চালচিত্র মানে কাঠামো। মৌলিক জীবনধারণের সত্তা বা অস্তিত্ব।' (চাষিবাড়ির সাদিয়া)

মোট পঁয়ত্রিশটি লেখার কতগুলোকে মূল ফিচার বলা যেতেই পারে। যেমন 'শ্যামগঞ্জের বড়ো সরদার', 'দর্জিপাড়া মেটিয়াব্রুজ', 'তিয়োর বোনেন বাঁশের অটল', 'ধানের নাম লক্ষ্মী', 'পান', 'কুমোরবাড়ি : কলসি-হাঁড়ি', 'পরিজন', 'তাঁত বোনে তাঁতী' এই সাতটি রচনা মূলত তথ্যমূলক, যাকে বলা যেতে পারে সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রান্ত। তবে এ কাজে যে জাত - সাহিত্যিকের তা বোঝা যায় বৈকি। তিয়োরদের লেখাটি বাদ দিলে, অবশিষ্ট রচনাগুলিতে দেখি এই সমস্ত সমাজের সঙ্গে তিনি তত পরিচিত নন যতটা গোরুর দালাল, গাড়োয়ান, জেলে, চাষি, কারখানার শ্রমিকদের সাথে। এগুলিতে তিনি মূলত এক দরদি পর্যটক। আমাদের মনে পড়ে যায় সুধীর কুমার চক্রবর্তীর গ্রাম - ভ্রমণের রচনাগুলি।

'মা-মনসা : বাবা শা-ফরিদ' রচনাটিও ভ্রমণের। তবে স্বাদ আলাদা। এখানে তথ্য সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ততটা নেই, যতটা আছে সমাজকে বুঝবার চেষ্টা। গায়ে গায়ে গড়ে উঠেছে হিন্দু - মুসলিমদের দুটি গ্রাম্য ধর্মক্ষেত্র। এখানে মানুষের আসবার উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্মানুসন্ধান নয়, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি জীবনের নানা বালাই থেকে উদ্ধার পাওয়া। দুটি থানেই হিন্দু-মুসলিম উভয়ে যান। আগত যাত্রীদের আচরিত প্রথা তাঁর কুসংস্কার বলেই মনে হয়েছে। তবু ভাবছেন, 'দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর তখন মা মনসা আর বাবা শা-ফরিদের এই সহ-অবস্থান বেশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এ এক চমকপ্রদ তীর্থ—যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বালাই নেই।'

'কাবুলিওয়ালা', 'মাংস ও কসাই', 'জয়নগরের মোয়া' লেখা দিনটির উপজীব্য তিনটি পেশা ও সেই আবর্তে এসে পড়া মানুষদের কাহিনি।

'গরুহাটা বিবিরহাট : উলুবেড়িয়া', 'মিঠে জল ? বুপোলি ইলিস/ পাথর কালো জেলে' রচনাদুটির চরিত্র ও পবিশের সাথে লেখকের পরিচয় গভীর। গোরুর দালাল নরেন কোরোংয়াঁ কিংবা ইলিস - ধরা জেলে কলিমুদ্দিকে যে তিনি শুধু কাছ থেকে দেখেছেন তাই নয়, ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। তাদের মুখের ভাষাও তুলে এনেছেন বিশ্বস্তভাবে। তাদের কথা সব সময় শহুরে রুচির সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু চরিত্রগুলিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে। গোরুর যদি শোয় তাহলে আমার মেয়ে সনে তোমার ''লিখে'' দিয়ে দেব।' অথবা নৌকোয় যখন কলিমুদ্দি তার হবু জামাই ইয়ার আলিকে তাড়ি প্রথমে দেয় তখন সে সম্মান দেখিয়ে জিভ কেটে বলে ওঠে 'তুমি অগএগের খাও চাচা, তুমি মুরুব্বি-গুরুজন'। কলিমুদ্দি খুশি হয়ে তাড়িটুকু গলায় ঢেলে বলে 'বেশি খেলে আবার আমার প্যাটে সয় নে রে বাপ। কাছা খুলতে তর দেয় নে— একবারে সর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌...'। তবু মনে হয় রচনাগুলি গল্পসাহিত্যের গা ঘেঁষে গেলেও পুরোপুরি গল্প হয়ে উঠল না। নরেনের চরিত্রটির চিত্রায়ণ শুরু হয় সুপটুভাবে, কিন্তু যেন শেষ হয় না। নৌকোর বিপরীত জীবনে তিনি জেলে - মাঝি কালিমুদ্দি, ইয়ার আলি আর কানাই, মেছুনি পরিস্কারি দাসী, মাছের মহাজন, কলিমুদ্দির মেয়ে মরজিনা যে কিনা ইয়ার আলির হবু স্ত্রী—সব চরিত্রগুলিই তাদের রক্ত - মাংস নিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু পরিণতির দিকে যায় না। একই ছন্দে লেখা সমুদ্র - জেলের জীবন নিয়ে— 'শামুদ্দি জেলে এবং সমুদ্র'। ভোরবেলায় শামুদ্দির সমুদ্রবেলায় একলা ঘুরে বেড়ানোর অংশটি আকর্ষণীয়।

'সাপমন্ত্র এবং সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি', 'ছানার দালাল', 'গাড়োয়ান', 'দানসাদ মিস্ত্রির কথা', 'মেদিনীপুরের ফকির', 'বদলিওয়ালা' এবং আগে আলোচিত 'জয়নগরের মোয়া' বা 'শ্যামগঞ্জের বড় সরদার' —এই লেখাগুলি প্রত্যেকটি এক - একজন মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। ওই আবর্তন কিন্তু তার সমাজকে সাথে নিয়ে। তাই এই সব কাহিনি যেমন ওই মানুষগুলির জীবনের তেমনই তাদের চারপাশের সমাজজীবনের। থানার দালাল নবকেষ্ট যেমন থানায় থানায় থাকা সমস্ত দালালদের প্রতিভূ, কিংবা কারখানার 'লিজ কাজ' না পাওয়া বদলি শ্রমিক রহমান যেমন তার সব বদলি - মানুষদের প্রতিভূ, —ঈশ্বর ঢালি, ফকির জিয়া হায়দার বা দানসাদ মিস্ত্রি কিন্তু তা নয়, তারা তাদের পেসার অন্য মানুষদের থেকে আলাদা মহিমায় চিত্রিত। থানার দাদাল নবকৃষ্ম দাস বা সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালিকে নিয়ে আর কেউ বোধহয় লিখতে পারত না। তাদেরকে আব্দুল জব্বার যতখানি কাছ থেকে দেখেছেন নবকৃষ্ন কোনো ফেনমেন্ নয়, সে তার মতো আরও অনেকের প্রতিনিধি। ঈশ্বর ঢালি সফল

সাপুড়ে এবং ও সফলতর ওঝা। তার 'নাম শুনলে সবাই ভক্তিভরে গড় করে। এ যুগের সাক্ষাৎ শিবঠাকুর ও বেটা। গলায় ওর সাপের মালা। ''বিশধর কালফণীকে'' নিয়ে খেলা করে।' আকর্ষণীয় তার চেহারা ও বেশ-বাস। 'মাথায় চুড়োবাঁধা চুল ঈশ্বর ঢালির। তাতে ফুলের মালা জড়ানো। গলায় লাল কাটির মালা। দক্ষিণ বাজুতে ওস্তাদ কালু কয়ালের বখশিশ দেওয়া রুপোর তক্তি। তাতে আরবি হরফে লেখা ইসলামের মূলমন্ত্র।...মুখে কটা রঙের গোঁফ - দাড়ি। চমৎকার গড়ন তার দেহের। তীক্ষ্ণ খাঁড়া মতো নাক। চোখ দুটো দীর্ঘ, বিকশিত আর বুদ্ধিদীপ্ত। যেন আঙরায় আগুন জ্বলছে। কপালে একটা লাল ফোঁটা।' ঈশ্বর ঢালি সাপের বিষ নামানো মন্ত্রে যেমন দক্ষ, তেমনই পটাশ পারম্যাংগানেট ও ইন্‌জেকশনের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে। তার গান ও মন্ত্রগুলি একেবারে খাঁটি, লেখক কাঁচি চালালেও কোথাও কলম চালাননি। সে একজন Performing artist। গান গেয়ে, খেলা দেখিয়ে, মানুষের মনোরঞ্জন করে সে আননদ পায়। তাই ঈশ্বর ঢালি তার আকর্ষণীয় চেহারা, বুদ্ধি, ছড়া- গানে মুনশিয়ানা, বুদ্ধিমত্তা ও অশ্লীলতা নিয়ে মনে রাখবার মতো একটা মানুষ। করিম গাড়োয়ানের চরিত্রটিও আগ্রহোদ্দীপক। শহরে মাল পৌঁছে একা গোরুর গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাড়ি ফিরতে তার প্রায় রাত হয়ে যায়। সে নিজেকে বলে 'রাতচরা'। তার একটি রোমহর্ষক কাহিনি এইরকমই রাতের বেলায়। 'মাল খালাস করে ফিরতে রাত হল। পথে ''জন-মনিষ্যি'' নেই। এমনি ''চোত''মাস। ঝড়ো হাওয়া ছুটে যাচ্ছিল গাছপালা বাঁশঝাড়ে আড়মোড়া ভেঙে।...ট্যাংরাখালির মরাপোতা! গা যেন শিউরে উঠল। এবার কাঁচা রাস্তায় নাবতে হবে। গাইদুধের মতন সাদা জ্যোছনা - ধোওয়া পথ। মাঝে মাঝে পাক মেরে ধুলো উড়তেছে।...' মানুষের মুখের ভাষায় পটু নিসর্গ বর্ণন। ভয়ের গল্পের উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু ভয়ের ছবি মোড় নিয়েছে এক বীভৎস দৃশ্যে। সেখানেই থেমে গেল লেখাটি সার্থক হত না। বীভৎসতাকে অতিক্রম করে জয়ী হয়েছে গাড়োয়ানের মানবিক চিত্তবৃত্তি। তা তাকে অতিক্রম করিয়েছে ভয়, অতিক্রম করিয়েছে ধর্ম-জাত-পাতের গণ্ডি। তারমত লোক সংসারে বড় দুর্লভ।' নিজের পেশায় সে অতুলনীয় আরও অনেক রকম কাজ জানে সে। কিন্তু তার আসল পরিচয় হল সে একজন শিল্পী। এই পরিচয় ফুটে ওঠে তার রাজমিস্ত্রির কাজেও। সে ভালো গান করে। মরমি কাহিনিতে পুঁথি লেখে। ইংরিজি তত না জানলেও আরবি, উর্দু, ফরাসি জানে। তাজমহল দেখে তার গঠনের শৈল্পিক মূল্যায়ন করে। তার অসাধারণত্ব প্রথম দেখলে বোঝা যায় না। যে বাড়ি সে গড়ছে তার মালিকের কলেজে পড়া মেয়ে সুনন্দা তাকে প্রথমে 'মিস্ত্রি', 'তুমি', বলে সম্বোধন করে। ক্রমশ তা হয়ে যায় 'দানসাদ কাকা' 'আপনি'। দানসাদ অবশ্য আপত্তি করে। বলে, 'আমাকে ''তুমি'' বলবে।...যারা বাবা কাকা মামা আত্মীয়স্বজনকে ''আপনি'' বলে তারা যেন বড্ড বেশি শৌখিন—মাটি ছাড়া।' তবে দানসাদের মুখে যেন মাঝে - মাঝে জব্বারই কথা বলে ওঠেন। তখন তার ভাষা যেন তার মুখের ভাষা নয়, জব্বারের মুখের ভাষা।

'বুভুক্ষা' একটি ভিখিরি পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'বদলিওয়ালা' আর 'বুভুক্ষা' দুই প্রান্তবাসী পরিবারের কথা যাদের অর্থনৈতিক অবস্থান সব গণ্ডিরই অনেক নীচে। গভীর রাত্রির পরেও যেমন এক সময় ভোরের আলো ফুটে ওঠে, তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জীবনে দূর ভবিষ্যতেও তেমন কোনো আলোর আশা নেই। এই অন্ধকারের মধ্যেই কোনোমতে টিকে থাকা হল তাদের জীবন। আঘাত এলে প্রতিবাদ করবার শক্তি সাহস এদের আর অবশিষ্ট নেই। এই লেখাগুলি পড়ে 'খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে থেকে' আসা 'নির্ভুল জাত-সাহিত্যিক' জব্বার সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি মনে পড়ে—'নীচের তলার জগৎ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বাস্তব এবং কখনো কখনো এত নির্মম বাস্তব যে রীতিমতো গা শিউরে ওঠে।'

'হলদে টাকা : সোনালি চাঁদ', 'চাষীবাড়ির সাদিয়া', 'বদলিওয়ালা', — একগুলি একটি পরিবেশে কিছু মানুষের এক - দুদিনের ঘটনার প্রতিচ্ছবি। 'কান্না কবর' 'কিয়ামত'ও তাই। এ লেখাটির সৌন্দর্য সম্ভ্রান্ত মুসলিম বাড়িতে মৃতের অন্ত্যেষ্টির পুংখানুপুংখ দরদি বর্ণনায়।

'কাঠ কাটে কাঠুরে' লেখায় জুতোর গোড়ালি বানানোর জন্য কাঠের চকোর প্রস্তুতির ব্যবসার কথা আর নানা কাজে অসংযমী বৃক্ষ - নিধনের কথা বলা হয়েছে। এই অপরিমিত বৃক্ষ-নিধন জব্বারের ভালো লাগে না। তিনি হিন্দুদের বৃক্ষ-প্রীতি এমনকী বৃক্ষ - উপাসনার সনাতন প্রথার কথা ভাবেন। নিজস্ব ঢং-এ বলে ওঠেন 'বড় বড় বেল, বট, অশথ, নিম, সবেদা, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, লিচু, আঁসফলগাছের গোড়ায় যখন করাত টানা হয়, তখন আমার যেন মনে হয় হিন্দু মুনিঋষিদের হাড়ের উপর দিয়ে তা চলেছে নির্মমভাবে।'

'জনক', 'বৃহন্নলা সংবাদ', 'সাগরদ্বীপের মহাজন', 'সরাবন তহুরা', 'সেয়ানে সেয়ান', 'বাবা বড় কাছারি' এবং আগে আলোচিত 'বুভুক্ষা' ও 'বদলিওয়ালা'— এই লেখাগুলিকে আলাদা করা যায় এগুলির মধ্যের ছোটোগল্পের লক্ষণের জন্য। বস্তুত বাংলার চালচিত্রের সাধারণ লক্ষণ থাকা সত্তেও এদের আমরা রসোত্তীর্ণ ছোটোগল্প বলে দাবি করতে পারি। এই গল্পগুলিও, বলা বাহুল্য, অন্যদের মতোই জীবন থেকে নেয়া। জনক হল এক চাষি। তার নাম ইনসান হলেও সে জঙ্গলের নরখাদক বাঘের মতো ভয়ংকর আর হিংস্র। কিন্তু স্বাধীনচেতা ছেলে আজাদকে সে বাগে আনতে পারে না। কিন্তু একদিন আত্মরক্ষার্থে এক মুচিকে খুন করে আজাদ ছ-মাসের জন্য জেলে গেল। ইনসানের 'বাপের প্রাণ। ছেলেটার জন্য হু হু করে।' তবু 'ইনসান খুশি। তার ছেলে প্রতিশোধ নিয়েছে, বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়েছে।' 'সাগরদ্বীপের মহাজন' সুন্দরবনে কাঠ কাটতে যাওয়া মানুষদের নিয়ে

লেখা। মহাজন তোরাব মহাজনকে সমর্থন করবার জন্য সে তাদের গাইড ও মন্ত্র - পড়িয়ে সেদো অর্জুন কয়ালকে বেইমানি করে গুলি করে মারে নির্দ্বিধায়। 'সরাবন তহুরা' এক চোলাই মদ প্রস্তুতকারক বিক্রেতা ও তার পরিবারের টক্করের গল্প। 'বাবা বড় কাছারি' সম্পন্ন চাষিবাড়ির পরিবারের ঘটনা নিয়ে। বাড়ির বড়ো ছেলের সন্তান হয় না শেষে কী করে তা হল তাই নিয়ে কাহিনি। শাশুড়ি ও পুত্রবধূর চরিত্রদুটি জীবন্ত। এইটও সার্থক ছোটোগল্প। 'বৃহন্নলা সংবাদ' গল্পটি বহু আলোচিত। এটি হিজড়েদের নিয়ে লেখা। লেখাটি তার অপরিচিত চরিত্রায়ণ ও মানবিক টানের জন্য সাহিত্যনুরাগীদের মনে স্থান করে নিয়েছে।

জব্বার তাঁর 'বাবা বড় কাছারি', 'সাপমন্ত্র এবং সাপুড়ে ঈশ্বর ঢালি', 'মেদিনীপুরের ফকির', 'মা-মনসা : বাবা শা-ফরিদ' ইত্যাদি গল্পের বার বার দেখিয়েছেন যে তিনি অন্ধভাবে কিছু বিশ্বাস করে নেওয়ার পক্ষপাতী নন। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে তিনি সব কিছুর কারণ অনুসন্ধান করতে চান। মানুষ জব্বারের মনে এই অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যটি তাঁর গড়া চালচিত্রে যত্নে তোলা নকশার মতো ফুটে উঠেছে।

'মনের ছবি : গ্রিগরের ঘোড়া' রচনাটি অন্যগুলির থেকে আলাদা। এটি লেখকের মনে আসা বিভিন্ন টুকরো ছবি ও চিন্তার প্রকাশ।

জব্বারের চালচিত্র কদাচিৎ আত্মজৈবনিকও বটে। 'চাষিবাড়ির সাদিয়া' যদিও সম্পন্ন মুসলমান চাষি পরিবারের একদিনের নোটিশে একটি সাদি-ব্যবস্থাপনার জমাট কাহিনি, সেটি কিন্তু শুরু হচ্ছে রাতের বেলা বাড়ির মেয়েদের ধান ভাঙার দৃশ্যে। প্রথমেই 'বাড়ির বুড়ি রূপজান বিবির' সাদিতে পাওয় যৌতুকের ফর্দ। তার 'দুহাত ভরা দায়মল কাটা বাতানা, নাকে ফাঁদি নথ, কানে ঝুমকো, কোমরে বিছে হার। বৈঁচি, গোট, হাঁসুলি, সিঁথেপাটি, আঙুল ছুটকি, চুলের কাঁটা, তাগা, তাবিজ, মল সব খোলা আছে। এখন। সবই রূপোর। শুধু নথটা সোনার। সব মিলিয়ে দু সের ওজন! তার বাপ দিয়েছিল সাদির যৌতুক হিসেবে। আর ''লৈকতায়'' পাওয়া মণ খানেক থালা, বাটি, গেলাস, ডাবর,...।' কাহিনি ক্রমে সাদির আয়োজনের তাড়ায় গতি পায়, কিন্তু খুঁটিনাটির প্রতি নজর হারায় না। যখন সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় তখনও কেউ খবর রাখে না যে 'একটি মিষ্টি চাওয়ার অপরাধে' গৃহকর্তার বিধবা বোন আয়মনের 'বড় ছেলে তার বড় মামার হাতের একটা চড় খাওয়ার পর আর তার ছেলে দুটো সারাদিন কিছুই খায়নি।' একেবারে শেষে আমরা দেখি আয়মনের বড়ো ছেলে এখন লেখক। 'তার একখানা উপন্যাস ইলিশমারির চর বেশ নাম করেছে।' তখন বুঝি কী নির্বিকার অনাসক্তিতে জব্বার তাঁর অনাদৃতা, অত্যাচারিতা মা আয়মনের জীবন চিত্রিত করেছেন। 'জিব্রিলের ডানা' লেখাটি এই আলোচকের বড়ো প্রিয়। তাই সেটাকে আলোচনার শেষে রাখা হয়েছে। ছোটো লেখাটিতে ঘটনার নাটকীয়তা, কারুণ্য ও বীভৎসতার বিচিত্র সমাবেশ। তবু তা সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠে লেখকের সততা ও সংযমের মেলবন্ধনে। এই দৃষ্টিতেই তার চার-পাঁচ বয়সে দেখা বাবার ছবি এঁকেছেন অল্প কথায়, দরদ দিয়ে। 'যত দূর মনে পড়ে আমার বাবার মূর্তিটা ছিল অনেকটা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতন মিষ্টভাষী, সদালাপী, জ্ঞানী-গুণী, ধার্মিক পুরুষ তুমি হতে পারবে না।...'কাহিনির ক্লাইম্যাক্সে, অন্ধ হয়ে যাওয়া অসহায় বাবা স্ত্রী ছেলেদের কষ্ট দেখতে না পেরে ভোরবেলায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। শিশু জব্বারকে ডেকে তোলা হয় মাকে খবরটা দিতে পাঠানোর জন্য। বেচারি মা তখন গেছেন মামাবাড়িতে ধান কুটতে। শিশু জব্বার ফিরে বাইরে এসে দেখল 'গোয়ালের আড়কাঠটায় সে কার যেন মৃত্যুর পর জানাজা পড়ানোর কাপড়টা— যেটা শীতের সময় মা আমার গলায় বেঁধে দিত— সেইটে পাকিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলে আছেন আমার জ্ঞানীগুণী বাবা। তিনি কখন লুকিয়ে আমাকে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ক'রে রেখে কাঁথা চাপা দিয়ে মুখের মাথায় চুমু খেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে এসে এককড়া একটা মই খুঁজে নিয়ে উঠে গলায় ফাঁস পরিয়ে মইটা পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে দিয়েছে ঝুলে পড়েছেন।' জানা গেল একটু আগে গলায় ফাঁস - পরা অবস্থায় ছটফট করতে দেখেও, গতকালের একটু তুচ্ছ ঝগড়ার কারণে, জব্বারের চাচা-চাচি তখনও প্রাণ থেকে যাওয়া তার বাবাকে নামায়নি। মাকে নিয়ে ফিরে আসার পরে সেই মৃত্যুদশার আরও বর্ণনা দিচ্ছেন— 'মৃত্যু কী ভীষণ! বাবা একবার জবির মল্লিকের একটা কালো দাম্‌ড়া গুরু জবাই করার সময় তার অমনি আমড়া আমড়া চোখ বেরিয়ে পড়েছিল। (আমি ভয়ে চিল-চীৎকার ক'রে পালাতে সবায়ের সে কি খল্‌খল্‌ করে হাসি।') সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় লেখক মৃত্যুর ভীষণতা, মা ও ছেলের অসহায়তা, এবং প্রতিবেশী আত্মীয় - স্বজনের অসংবেদনার ছবি তুলে ধরেছেন। অসহায় দুখিনি মাকে মামারা আবার নিকে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ছেলেদের কথা ভেবে রাজি হননি। ছেলেদের অনুরোধ করতেন তারা যেন বড়ো হয়ে আবার তাদের বাপের ভিটেয় আলো জ্বালে। লেখাটির শেষ লাইন— 'মা, আমার লক্ষ্মী মা, সে আলো সে নিজেই জ্বেলেছে আমার বাপের ভিটেতে।'

জব্বারের গ্রাম বজবজের বাওয়ালিতে কি খুঁজলে এখনও পাওয়া যাবে এমন কোনো বৃদ্ধকে যিনি বলে উঠবেন, 'জব্বার? ওর সব গল্পই তো আমিও জানি। কেবল ও লিখেছে এই যা।'